بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ মোতাবেক ২৯ ফাতাহ্, ১৪০২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজও উহুদের যুদ্ধের আরো কিছু বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরব। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে, গিরিপথ খালি ছেড়ে আসার কারণে কাফিররা পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে এবং যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। শত্রুদের আক্রমণ অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল। তখন মহানবী (সা.)-এর অবিচলতা, সাহস এবং বীরত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা আছে যে, যুদ্ধের মোড় ঘুরে যাওয়ার পর সাহাবীরা উদভ্রান্তির মাঝে নিজেদেরকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি এবং বিশৃঙ্খলার শিকার হয়। তখন মহানবী (সা.) এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিজের চতুর্দিকে শত্রুদের উপস্থিতি সত্ত্বেও নিজের জায়গায় অবিচল ও অটল থাকেন। বিচলিত হয়ে সাহাবীদের দিগ্বিদিক ছুটতে দেখে তিনি (সা.) তাদেরকে ডাকতে গিয়ে বলছিলেন, হে অমুক! আমার কাছে আসো। হে তমুক! আমার কাছে আসো, আমি খোদার রসূল। অথচ চতুর্দিক থেকে তাঁর প্রতি বৃষ্টির মতো তির বর্ষিত হচ্ছিল। একটি রেওয়ায়েতে আছে, তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলছিলেন, **انا النبي لا كذب ـ انا ابن عبد المطلب ـ انا العبدالعواتق** অর্থাৎ, আমি নবী, এতে (কোনো) মিথ্যা নেই। আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। আমি আওয়াতেক অর্থাৎ আতকাদের পুত্র। সাধারণত এসব রেওয়ায়েত এবং জীবনচরিতের গ্রন্থাবলীতে আছে যে, তিনি (সা.) হুনায়নের যুদ্ধে এই কথাগুলো বলেছিলেন। কিন্তু হতে পারে উহুদ ও হুনায়েন উভয়ে যুদ্ধের সময় বলে থাকবেন। এখানে আওয়াতেক এর উল্লেখ করা হয়েছে। আওয়াতেক হলো আতকার বহুবচন। আর আতকা নামের একাধিক মহিলা ছিলেন। যারা মহানবী (সা.)-এর জাদ্দাত তথা দাদী ও নানীরা ছিলেন। একজন ছিলেন, আতকা বিনতে হেলাল, যিনি আব্দে মানাফ এর মা ছিলেন। দ্বিতীয়জন আতকা বিনতে মুর্‌রা, যিনি হাশেম বিন আব্দে মানাফ এর মা ছিলেন। তৃতীয়জন আতকা বিনতে অওকস, যিনি ওয়াহাব অর্থাৎ হযরত আমেনার (পিতার মা) বা দাদী ছিলেন। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এরা নয়জন মহিলা ছিলেন, তিনজন ছিলেন বনু সুলায়েম গোত্রের আর বাকি ছয়জন অন্যান্য গোত্রের ছিলেন। তারা সবাই মহানবী (সা.)-এর জাদ্দাত (বা দাদী-নানী) ছিলেন। এই ঘটনার বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন (পুস্তকে) লিখেছেন,

আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের (রা.)-র সঙ্গীরা যখন দেখলো যে, মুসলমানরা জয়যুক্ত হয়েছে তখন তারা নিজেদের আমীর বা দলনেতা আব্দুল্লাহ্ (রা.)-কে বলে, এখন তো বিজয় হয়ে গেছে আর মুসলমানরা গণিমতের মাল একত্র করছে; আপনি আমাদেরকে (ইসলামী) সেনাদের সাথে গিয়ে যোগ দেওয়ার অনুমতি দিন। আব্দুল্লাহ্ (রা.) তাদেরকে বাধা প্রদান করেন এবং মহানবী (সা.)-এর তাকীদপূর্ণ নির্দেশনা স্মরণ করান, কিন্তু তারা বিজয়ের আনন্দে উদাসীন হয়ে পড়ে। তাই তারা এথেকে বিরত হয়নি এবং একথা বলতে বলতে নীচে নেমে যায় যে, মহানবী (সা.)-এর (নির্দেশনার) অর্থ কেবল এটি ছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত পুরোপুরি আশ্বস্ত না হবে (ততক্ষণ পর্যন্ত) গিরিপথ অরক্ষিত ছাড়বে না। আর এখন যেহেতু

বিজয় হয়ে গেছে তাই যাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। এরপর শুধুমাত্র আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের (রা.) এবং তার পাঁচ থেকে সাতজন সঙ্গী ছাড়া গিরিপথের সুরক্ষায় আর কেউ ছিল না। খালিদ বিন ওয়ালীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দূর থেকে গিরিপথের দিকে তাকিয়ে সেটি খালি বা অরক্ষিত দেখতে পায়। তখন সে তার অশ্বারোহীদের দ্রুত সমবেত করে সঙ্গে সঙ্গে গিরিপথ অভিমুখে এগোয় আর তার পেছনে পেছনে ইকরামা বিন আবু জাহলও অবশিষ্ট দলকে সাথে নিয়ে ত্বড়িৎ সেখানে পৌঁছে এবং এই উভয় দল আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের (রা.) এবং তার কয়েকজন সঙ্গীকে স্বল্পতম সময়ে শহীদ করে ইসলামী সেনাদলের পশ্চাতভাগ দিয়ে আচমকা আক্রমণ করে বসে। মুসলমানগণ যারা বিজয়ের আনন্দে গা-ছাড়া দিয়েছিল আর ছড়িয়েছিটিয়ে পড়ছিল, এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে বিচলিত হয়ে পড়া সত্ত্বেও নিজেদের সামলে নিয়ে কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করছিল, তখন জনৈক চতুর শত্রু একথা বলে যে, হে মুসলমানরা অপর দিক থেকেও কাফিররা আক্রমণ করছে। অর্থাৎ, সেদিক থেকেও আক্রমণ হয়েছে। মুসলমানরা আতঙ্কিত হয়ে আবার পিছু হটে এবং হতবিহ্বল হয়ে এলোপাথারি নিজেদের লোকদের ওপরেই তরবারির আঘাত করতে থাকে। অপরদিকে মক্কার এক নির্ভীক মহিলা আমরা বিনতে আলকামা যখন এই দৃশ্য দেখে তখন ত্বড়িৎ সামনে অগ্রসর হয়ে মাটিতে পড়ে থাকা কুরাইশের পতাকাটি উচ্চকিত করে। আর এটি দেখামাত্রই কুরাইশের বিক্ষিপ্ত সৈন্যরা একত্রিত হয়ে যায়। আর এভাবে মুসলমানরা বাস্তবেই চতুর্দিক থেকে শত্রুর মাঝে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। আর ইসলামি সেনাবাহিনীতে চরম ত্রাসের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। কীভাবে মুশরিকরা একত্রিত হয়েছিল, কীভাবে আক্রমণ করেছিল আর কে পতাকা উড়িয়েছিল এতটুকু পূর্বের খুতবায়ও বর্ণিত হয়েছিল। যাহোক, এরপরের ঘটনা হলো, মহানবী (সা.) একটি উচুঁ স্থানে দাঁড়িয়ে পুরো দৃশ্য দেখছিলেন আর মুসলমানদের ক্রমাগতভাবে ডাকতে থাকেন। কিন্তু এই হই-হট্টগোলের মাঝে তাঁর (সা.) আওয়াজ চাপা পড়ে যাচ্ছিল। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, এসব কিছু এত অল্প সময়ে ঘটে যায় যে, অধিকাংশ মুসলমান একেবারেই দিশেহারা হয়ে পড়ে। এমনকি এই দিশেহারা অবস্থায় কোনো কোনো মুসলমান একে অপরকে আক্রমণ করতে থাকে এবং শত্রু-মিত্রের মাঝে ভেদাভেদ করা সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ, স্বয়ং মুসলমানদের হাতেই কতিপয় মুসলমান আহত হয়। যেমনটি পূর্বের খুতবায়ও উল্লেখ করা হয়েছিল, হুযায়ফার পিতা ইয়ামানকে তো মুসলমানরা ভুলক্রমে শহীদই করে দিয়েছিল। হুযায়ফা তখন নিকটেই ছিলেন, তিনি চিৎকার করে বলছিলেন- হে মুসলমানগণ! ইনি আমার পিতা, কিন্তু সে সময় কে শোনে কার কথা। পরবর্তীতে মহানবী (সা.) মুসলমানদের পক্ষ থেকে ইয়ামানের রক্তপণ পরিশোধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হুযায়ফা (রা.) তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান আর বলেন, আমি আমার পিতার রক্তপণ মুসলমানদের জন্য ক্ষমা করে দিলাম।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একটি অমানিশাপূর্ণ মুহূর্ত ছিল সেটি, যখন মহানবী (সা.) উহুদের প্রান্তরে আহত হয়েছিলেন। তখন এমন সব ঘটনা ঘটেছিল যে, ইসলামি সেনাদলের বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল। সেই যুদ্ধে এমন একটি গিরিপথ ছিল যেখানে মহানবী (সা.) তাঁর কতিপয় সাহাবীকে নির্বাচন করে মোতায়েন করেছিলেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যুদ্ধের পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন তোমরা এই গিরিপথ ছাড়বে না। কাফির সৈন্যরা যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় তখন তারা ভুলক্রমে মনে করে যে, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ কি! আমরাও গিয়ে কিছুটা হলেও

যুদ্ধে অংশ নেই। তাদের দলনেতা তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ স্মরণ করিয়ে বলেছিলেন, আমরা যেন এই গিরিপথ পরিত্যাগ না করি। কিন্তু তারা বলে, মহানবী (সা.)-এর কথার অর্থ তো এটি ছিল না যে, বিজয় লাভের পরেও এখানেই (ঠায়) দাঁড়িয়ে থাকবে। তাঁর আদেশের অর্থ ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে এই গিরিপথ পরিত্যাগ করবে না। যেহেতু এখন বিজয় অর্জিত হয়েছে এবং শত্রুরা পলায়নপর, তাই আমাদেরও জিহাদ থেকে কিছু পুণ্য অর্জন করা উচিত। কাজেই, সেই গিরিপথ অরক্ষিত হয়ে পড়ে। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ তখনও মুসলমান হননি এবং যুবক ছিলেন আর ছিলেন দূরদৃষ্টির অধিকারী। তিনি যখন সৈন্যসমেত পলায়ন করছিলেন তখন কাকতালীয় ভাবে পেছনের দিকে তাকিয়ে গিরিপথ অরক্ষিত দেখতে পান। এটি দেখামাত্রই ফেরত আসেন এবং পেছনদিক থেকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করেন। এই আক্রমণ যেহেতু মুসলমানদের জন্য একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল তাই তারা চরম আতঙ্কিত হয়ে পড়ে আর বিক্ষিপ্ত থাকার কারণে শত্রুদের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয় নি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) সূরা নূরের ৬৪ নাম্বার আয়াতের তফসীর বা ব্যাখ্যায় এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেন,

যারা এই রসূলের নির্দেশের বিরোধিতা করে তাদের এই বিষয়ে ভয় করা উচিত যে, কোথাও তাদের ওপর খোদা তা'লার পক্ষ থেকে কোনো বিপদ না নেমে আসে অথবা তারা কোনো কষ্টদায়ক শাস্তিতে নিপতিত না হয়ে যায়– এটি হলো উক্ত আয়াতের অনুবাদ। তিনি (রা.) বলেন, অতএব দেখো! উহুদের যুদ্ধে এই আদেশ অমান্য করার কারণেই ইসলামী সেনাবাহিনীর কতটা ক্ষতি হয়েছে। মহানবী (সা.) একটি পাহাড়ী গিরিপথের সুরক্ষার জন্য ৫০জন সৈনিক মোতায়েন করেছিলেন। এই গিরিপথ এতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তিনি তাদের প্রধান আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের আনসারীকে ডেকে বলেন, আমরা নিহত হই বা বিজয়ী হই তোমরা এই গিরিপথ ছেড়ে যাবে না। কিন্তু কাফিররা যখন পরাজিত হয় আর মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন আরম্ভ করে তখন সেই গিরিপথে মোতায়েন সৈনিকরা তাদের দলনেতাকে বলে যে, এখন তো বিজয় লাভ হয়েছে; এখন আমাদের এখানে অবস্থান করা অর্থহীন। আমাদের অনুমতি দিন যেন আমরাও জিহাদে অংশ গ্রহণের পুণ্য অর্জন করতে পারি। তাদের দলনেতা তাদেরকে বোঝান যে, দেখো! মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অমান্য কোরো না। মহানবী (সা.) বলেছিলেন যে, বিজয় হোক বা পরাজয়; তোমরা এই গিরিপথ পরিত্যাগ করবে না। তাই আমি তোমাদেরকে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারি না। তারা বলে, মহানবী (সা.)-এর কথার অর্থ এটি তো ছিল না যে, বিজয় লাভ হলেও তোমরা (এখান থেকে) সরবে না। তাঁর বলার উদ্দেশ্য ছিল কেবল তাকিদ করা। এখন যেহেতু বিজয় লাভ হয়েছে, (তাই) আমাদের এখানে আর কী কাজ? অতএব তারা খোদার রসূলের নির্দেশের ওপর নিজেদের মতকে প্রাধান্য দিয়ে সেই গিরিপথ অরক্ষিত ছেড়ে দেয়। শুধুমাত্র তাদের দলনেতা ও কয়েকজন সঙ্গী বাকি থাকে। কাফির বাহিনী যখন মক্কার দিকে পলায়ন করছিল তখন হঠাৎ খালিদ বিন ওয়ালীদ পেছন দিকে তাকিয়ে গিরিপথটি খালি দেখেন। তিনি আমর বিন আসকে ডাকেন, তারা উভয়ে তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি, এবং বলেন যে; দেখো! কত ভালো সুযোগ। চলো আমরা ফিরে গিয়ে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করি। অতএব, এই উভয় জেনারেল বা সেনাপতি নিজেদের পলায়নপর সৈন্যদের সামলে নিয়ে ইসলামী বাহিনীর বাহু কর্তিত করে পাহাড়ে আরোহণ করেন। সেখানে উপস্থিত গুটিকতক মুসলমান, যারা শত্রুদের

মোকাবিলা করার সামর্থ্য রাখতো না, তাদেরকে টুকরো টুকরো করে ফেলেন আর ইসলামী বাহিনীর ওপর পেছন দিক থেকে আক্রমণ করেন। কাফিরদের এই আক্রমণ এমন অতর্কিত ছিল যে, মুসলমানরা, যারা বিজয়ের আনন্দে এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা আর প্রতিরোধ গড়তে পারেনি। কেবল গুটিকতক সাহাবী দৌড়ে মহানবী (সা.)-এর আশেপাশে একত্রিত হয়ে যান, যাদের সংখ্যা বড়জোর ২০জন ছিল। কিন্তু এই গুটিকতক লোক কতক্ষণ আর শত্রুদের মোকাবিলা করতে পারে। অবশেষে কাফিরদের একটি মিছিলের কারণে মুসলিম সৈন্যরাও পেছন দিকে সরে আসে আর মহানবী (সা.) রণক্ষেত্রে একাকী থেকে যান। এ অবস্থাতেই মহানবী (সা.)-এর শিরস্ত্রাণে একটি পাথর লাগে যার কারণে শিরস্ত্রাণের একটি পেরেক তাঁর মাথায় বিদ্ধ হয় আর তিনি (সা.) অচেতন হয়ে একটি গর্তে পড়ে যান, যা কতিপয় দুষ্কৃতিকারী ইসলামী বাহিনীর ক্ষতি করার জন্য খুঁড়ে ঢেকে রেখেছিল। এরপর আরও কিছু সাহাবী শহীদ হন। আর তাদের লাশ তাঁর পবিত্র দেহের ওপর এসে পড়ে। আর মানুষের মাঝে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, মহানবী (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন। কিন্তু সেই সাহাবীরা, যারা কাফিরদের সংখ্যার তোড়ে পেছনে সরে গিয়েছিলেন, কাফিরদের পেছনে সরতেই পুনরায় মহানবী (সা.)-এর চতুর্দিকে সমবেত হয়ে যান। তারা তাঁকে গর্ত থেকে বাইরে বের করে আনেন। কিছুক্ষণ পর মহানবী (সা.)-এর জ্ঞান ফিরে আসে আর তিনি (সা.) যুদ্ধক্ষেত্রের চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করেন যেন মুসলমানরা পুনরায় একত্রিত হয় আর তিনি (সা.) তাদেরকে সাথে নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে চলে যান। ইসলামী বাহিনীর কাফিরদের ওপর বিজয় লাভের পর একটি সাময়িক পরাজয়ের আঘাত আসার কারণ হলো তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন মহানবী (সা.)-এর একটি নির্দেশ অমান্য করেছিল এবং তাঁর নির্দেশনা পালন করার পরিবর্তে নিজেদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কাজ করতে আরম্ভ করেছিল। যদি তারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ সেভাবে করত যেভাবে ধমনী হৃদস্পন্দনের অনুসরণ করে, যদি তারা বুঝতো যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদেশ বাস্তবায়নের খাতিরে সমগ্র বিশ্ববাসীকেও যদি নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় তাহলে তা-ও এক তুচ্ছ বিষয়। যদি তাঁরা ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সেই পাহাড়ি গিরিপথ পরিত্যাগ না করত যেখানে মহানবী (সা.) তাদেরকে এই দিক-নির্দেশনা দিয়ে মোতায়েন করেছিলেন যে, আমরা বিজয় লাভ করি অথবা নিহত হই, তোমরা এই স্থান থেকে নড়বে না, তাহলে শত্রুপক্ষ পুনর্বার আক্রমণেরও সুযোগ পেত না আর মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদেরও কোনো ক্ষতি হতো না। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা যে বলেছেন, **তোমরা আদেশ অমান্য করার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছো,** এটি তারই পরিণাম ছিল।

অতঃপর অপর এক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সূরা কাউসারের অত্যন্ত সূক্ষ্ম তফসীর করেছেন, এটি বেশ বিস্তারিত তফসীর। সেখানেও তিনি (রা.) এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন,

আল্লাহ্ তা'লা উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন এবং কাফিররা পলায়ন করে। খালিদ বিন ওয়ালীদ এবং আমর বিন আস, যারা ইসলামের সুমহান সেনাপতি ছিলেন, তারা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং এ যুদ্ধে তারা কাফিরদের পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহানবী (সা.) সাহাবীদের একটি দলকে একটি গিরিপথে মোতায়েন করেন এবং তাদেরকে তাগিদপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করেন যে, আমাদের জয় হোক বা পরাজয়; তোমরা এই স্থান থেকে সরবে না। আমরা নিহত হই বা জীবিত থাকি, তোমরা এ স্থান ছেড়ে যাবে

না। মুসলমানদের মাঝে জিহাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল আর আজও আছে। যখন ইসলাম জয়যুক্ত হয় তখন এই গিরিপথে মোতায়েনকৃত সদস্যরা তাদের দলনেতাকে বলে যে, আমাদেরকেও জিহাদে কিছুটা অংশগ্রহণ করার অনুমতি দিন। ইসলাম বিজয় লাভ করেছে আর এখন কোনো বিপদের শঙ্কা নেই। তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) আদেশ দিয়েছিলেন যে, জয় হোক বা পরাজয়, আমরা নিহত হই বা জীবিত থাকি, এই স্থান থেকে নড়বে না। তাই আমাদের এখানেই থাকা উচিত। তারা বলে, মহানবী (সা.)-এর কথার অর্থ এটি তো ছিল না যে, বিজয় লাভ হলেও এখান থেকে সরবে না। তিনি তো আমাদেরকে সতর্কতামূলকভাবে এখানে মোতায়েন করেছিলেন। শত্রুপক্ষ এখন পলায়ন করেছে আর ইসলাম বিজয় লাভ করেছে। এখন আমরা এ স্থান ছেড়ে দিলে এবং জিহাদে গিয়ে কিছুটা অংশ নিলে আপত্তির কিছু নেই। দলনেতা অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ একটি কথা বলেছেন। তখন দলনেতা বলেন যে, শাসক যখন কোনো আদেশ দিয়ে দেন তখন অধীনস্থদের এই অধিকার থাকে না যে, তারা নিজেদের বুদ্ধি খাটাবে। মহানবী (সা.) আমাদেরকে বলেছিলেন যে, জয় হোক বা পরাজয়, আমরা নিহত হই বা জীবিত থাকি, এখান থেকে নড়বে না! আর তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়েছিলেন যে, এ স্থান যেন পরিত্যাগ না করা হয়। কাজেই তাঁর (সা.) নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের এখানেই অবস্থান করা উচিত। কিন্তু তারা এ কথা শোনেন নি আর নিজেদের ভ্রান্তির ওপর এতটা জোর দেয় যে, তাদের দলনেতাকে বলে, আপনিই থাকুন; আমরা যাচ্ছি। অতএব, তাদের সিংহভাগই চলে যায়, কেবল তাদের দলনেতা ও তার মুষ্টিমেয় সঙ্গী অবশিষ্ট থেকে যায়। কাফিরদের সেনাদল যখন পলায়ন করে, খালিদ বিন ওয়ালীদ খুবই বুদ্ধিমান এবং চতুর ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পরও তিনি চমৎকার কাজ করেছেন আবার কাফিরদের মাঝেও তিনি বড় মাপের সেনাপতি ছিলেন। তিনি যখন তার সেনাবাহিনীর সাথে পলায়ন করছিলেন তখন হঠাৎ তার দৃষ্টি সেই গিরিপথে পড়ে এবং তা খালি পরিদৃষ্ট হয়। তার সাথে আমর বিন আসও ছিলেন। তিনি আমরকে বলেন, আমরা একটি মোক্ষম সুযোগ লাভ করেছি। আমরও সেদিকে দেখেন আর উভয়ে নিজের বাহিনী নিয়ে ফিরে আসেন। খালিদ বিন ওয়ালীদ এক দিক দিয়ে ঘুরে এসে গিরিপথের ওপর আক্রমণ করেন আর আমর বিন আস অন্য দিক থেকে। আর গিরিপথে যারা মোতায়েন ছিলেন তাদেরকে হত্যা করে তারা পেছন দিক থেকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে বসে। মুসলমানরা উক্ত গিরিপথের দিক থেকে নিজেদেরকে সুরক্ষিত বলে জানতো আর তারা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল এবং সারির শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছিল আর অবশিষ্ট মুষ্টিমেয় কয়েকজন শত্রুর পিছু ধাওয়া করছিল। যখন খালিদ বিন ওয়ালীদ এবং আমর বিন আস তাদের পশ্চাৎভাগ থেকে আক্রমণ করে তখন মুসলমানরা একেকজন করে সম্পূর্ণ শত্রুদলের সামনে এসে পড়ে। কিছু মুসলমান নিহত হয় আর কিছু আহত হয় এবং বাকিদের পায়ের তলার মাটি সরে যায়, বিশেষভাবে যখন আক্রমণ করতে করতে শত্রু মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে উপনীত হয় তখন তাঁর (সা.) পাশে কেবল ১২জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এ উভয় সেনাপতি অর্থাৎ খালিদ বিন ওয়ালীদ এবং আমর বিন আস নিজেদের অন্যান্য কর্মকর্তাকেও সংবাদ পাঠায় যে, তোমরাও আক্রমণ করো। অতএব, তিন হাজার সৈন্য জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় এসে পড়ে। সে সময় শত্রুদের পক্ষ থেকে পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, তির বর্ষণ করা হচ্ছিল, অসি চলছিল আর সমস্ত ইসলামী সেনাদলে আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছিল। এমতাবস্থায় সাহাবীরা অতুলনীয় কুরবানী করেন কিন্তু নবোদ্দমে হামলাকারী তিন হাজার সেনাদলের সামনে তারা টিকতে পারেনি। এই আক্রমণে

মহানবী (সা.)-এর দুটি দাঁত শহীদ হয় আর তাঁর শিরস্ত্রাণে একটি পাথর লাগে যার ফলে শিরস্ত্রাণের একটি কীলক তাঁর (সা.) মাথায় বিদ্ধ হয় যার ফলে তিনি (সা.) অচেতন হয়ে একটি গর্তে পড়ে যান। তাঁর (সা.) পাশে যেসব সাহাবী দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁদের লাশ মহানবী (সা.)-এর দেহের ওপর পড়ে এবং তাঁর পবিত্র দেহ নিচে চাপা পড়ে যায় আর মুসলমানদের মাঝে শোরগোল ওঠে যে, মহানবী (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন। পূর্বেই মুসলমানদের পা উপড়ে গিয়েছিল আর এই সংবাদে তাদের অবশিষ্ট যৎসামান্য মনোবলও লোপ পায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায়ের অধীনে যখন কাফিরদের মাঝে এই খবর চাউর হয় যে, মহানবী (সা.) মারা গেছেন তখন তারা এরপর আর পুনরায় আক্রমণ করে নি বরং এটাই যথোচিত মনে করে যে, এখন যতদ্রুত সম্ভব মক্কায় ফিরে যাই এবং লোকদেরকে এই সুসংবাদ দেই যে, (নাউযুবিল্লাহ্) রসূলুল্লাহ্ (সা.) মারা গেছেন।

মহানবী (সা.) এর বীরত্ব এবং দৃঢ়তার বিষয়ে রেওয়ায়েতে এভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, মিকদাদ বিন আমর (রা.) উহুদের দিনের উল্লেখ করতে গিয়ে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র শপথ! মুশরিকরা (মুসলমানদেরকে বেধড়ক) হত্যা করে এবং মহানবী (সা.)-কে গুরুতর আহত করে। শোনো! সেই সত্তার শপথ যিনি তাঁকে (সা.) সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, মহানবী (সা.) এক বিঘতও পশ্চাৎপদ হননি বরং শত্রুর বিরুদ্ধে অবিচল থাকেন আর মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের একটি দল একবার তাঁর (সা.) কাছে ছুটে আসতো আবার আক্রমণের তোড়ে পৃথক হয়ে যেত। (অর্থাৎ কাফিরদের পক্ষ থেকে যখন আক্রমণ করা হতো তখন সবাই দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো) আবার পুনরায় ফিরে আসতো। অতএব, কখনো তিনি (সা.) দাঁড়িয়ে নিজের ধনুক দ্বারা তির নিক্ষেপ করতেন আবার কখনো পাথর নিক্ষেপ করে মুশরিকদেরকে প্রতিহত করতেন। তিনি (সা.) সাহাবীদের একটি দলের সাথে অবিচল ছিলেন।

অপর এক রেওয়ায়েতে দেখা যায় মহানবী (সা.) নিজের জায়গায় অবিচল থাকেন। এক পা-ও পশ্চাৎপদ হননি বরং শত্রুর সাথে মুখোমুখি যুদ্ধ করতে থাকেন আর নিজের ধনুক থেকে তাদের দিকে তির বর্ষণ করতে থাকেন এমনকি তাঁর ধনুকের তন্ত্রী ছিঁড়ে যায় এবং এর একাংশ তাঁর হাতে রয়ে যায় যার দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ১ বিঘত পরিমাণ। [অর্থাৎ যে তন্তুতে তির লাগিয়ে টান দেয়া হয় সেটি ছিঁড়ে যায়।] তখন উক্কাশা বিন মেহসান (রা.) তাঁর (সা.) কাছ থেকে ধনুকটা নেন যাতে পুনরায় তন্তু লাগিয়ে দিতে পারেন। তখন তিনি (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তন্তু পুরো আসছে না। তখন মহানবী (সা.) বলেন, এটিকে জোরে টান দাও তাহলে শেষ প্রান্তে পৌঁছবে। উক্কাশা (রা.) বলেন, সেই সত্তার শপথ যিনি তাঁকে (সা.) সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি সেটিকে জোরে টান দেই ফলে সেটি শেষ প্রান্তে পৌঁছে যায়। আমি ধনুকের কাঠে সেটিকে দুই বা তিন প্যাঁচ দেই। (ইতঃপূর্বে পুরো আসছিল না, এরপর মো'জেযা সংঘটিত হয় আর শেষ মাথা পর্যন্তও পৌঁছে যায়।) এরপর মহানবী (সা.) নিজের ধনুকটি হাতে নেন এবং তির নিক্ষেপ করতে থাকেন আর আবু তালহা (রা.) তাঁর (সা.) সম্মুখে ঢাল হয়ে তাঁকে আচ্ছাদন করে রেখেছিলেন। এক পর্যায়ে ধনুক ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং এর তির শেষ হয়ে যায়। তখন ধনুকটি কাতাদা বিন নোমান (রা.) নিয়ে নেন [এবং সেই ধনুকটি (পরবর্তীতে) সবসময় তার কাছেই ছিল।] এরপর মহানবী (সা.) পাথর নিক্ষেপ করতে থাকেন।

না'ফে বিন জুবায়ের বর্ণনা করেন, আমি মুহাজেরদের মাঝে এক ব্যক্তিকে একথা বলতে শুনেছি যে, আমি উহুদের যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। আমি দেখেছি সবদিক থেকে তির আসছিল আর মহানবী (সা.) তাদের মধ্যখানে ছিলেন। সব তির তাঁর (সা.) কাছ থেকে দূরে ছিটকে পড়তো। আমি আব্দুল্লাহ্ বিন শিহাব যুহরীকে দেখেছি, সেদিন তিনি বলছিলেন, তুমি আমাকে মুহাম্মদ (সা.)-কে চিনতে সাহায্য করো। তিনি রক্ষা পেলে আমার রক্ষা নেই। অথচ এসময় রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর পাশেই ছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে কেউ ছিল না। যখন সে রসূল (সা.)-কে অতিক্রম করে সামনে চলে যায় তখন সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা তাকে তিরস্কার করে। তখন সে বলে, আল্লাহ্র কসম! আমি তো তাঁকে দেখিনি। আল্লাহ্ তা'লা এভাবে তাঁকে (সা.) রক্ষা করছিলেন। আমি আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলছি, তাকে (সা.) আমাদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ করা হয়েছে। আল্লাহ্র কসম, আমরা চার জন মক্কা থেকে বেরিয়েছিলাম এবং তাকে (সা.) হত্যা করতে পরস্পর অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু আমরা তাঁর নাগাল পাইনি। ইবনে সা'দ বলেন, আবু নিমর কেনানী বলেন, আমি মুশরিকদের সাথে উহুদে অংশ গ্রহণ করেছি এবং আমি সেদিন পাঁচটি লক্ষ্য স্থির করে রেখেছিলাম এবং সেগুলো লক্ষ্য করে আমাদের তির নিক্ষেপ করছিলাম। আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দিকে লক্ষ্য করে দেখলাম তাঁর সাহাবীগণ তাকে ঘিরে রেখেছে এবং তাঁর ডানে-বামে তির পতিত হচ্ছে। কিছু তির তার (সা.) সামনে পড়ছিল, কিছু পিছনে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ইসলামের পথ দেখান [পরবর্তীতে তিনি মুসলমান হয়ে যান।]

এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেন,

মহানবী (সা.)-এর মক্কী জীবন একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। [তাঁর (সা.) বীরত্বের উল্লেখ করে তিনি বলেন,] একদিক থেকে তাঁর (সা.) সারাটা জীবনই দুঃখকষ্টের মাঝে কেটেছে। উহুদের যুদ্ধের রণক্ষেত্রে তিনি একাই ছিলেন। রণক্ষেত্রে আল্লাহ্র রসূল হিসেবে নিজেকে ঘোষণা দেয়া তাঁর (সা.) চরম সাহসিকতা, ধৈর্য ও অবিচলতার পরিচয় বহন করে। এরূপ শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থাতেও তিনি আত্মগোপন করেননি, বরং নিজের উপস্থিতির জানান দিয়ে যান, লোকেরাও জেনে যায়। অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, ইহুদিরা যেভাবে অভিশপ্ত ও লাঞ্ছিত হচ্ছে, যাতে আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি ও তার অসন্তুটি প্রকাশ পায়, আল্লাহ্র নবী ও ওলীগণের কষ্ট সে ধরনের হয় না। বরং নবীগণ বীরত্বের এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ইসলামের সাথে খোদা তা'লার কোনো শত্রুতা ছিল না, কিন্তু দেখুন উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) নিঃসঙ্গ হয়ে যান। এর উদ্দেশ্য ছিল মহানবী (সা.)-এর বীরত্ব যেন প্রকাশিত হয়। যখন মহানবী (সা.) দশ হাজার সৈন্যের মোকাবিলায় একা দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, আমি আল্লাহ্র রসূল! অন্য কোনো নবীর এরূপ দৃষ্টান্ত দেখানোর সুযোগ হয়নি।

উহুদের যুদ্ধে শত্রু সৈন্যের সংখ্যা তো তিন হাজার ছিল। প্রতিকার লিপিকারের লেখা এটি। তিনি হয়ত দুই যুদ্ধের উল্লেখ করে থাকবেন। আহযাবের যুদ্ধেও কাফেরদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। অন্যান্য যুদ্ধেও শত্রু সংখ্যা বিপুল ছিল। যাহোক, প্রকৃতপক্ষে [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এখানে মহানবী (সা.)-এর] যে দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করছেন তা হলো, তাঁর (সা.) বীরত্ব ও অনুপম দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ কাফেরদের সামনে একাই অবিচল ছিলেন। কোনো নবীর এরূপ দৃষ্টান্ত দেখানোর সুযোগ হয়নি।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লা মহাশক্তিধর, যে জিনিসে ইচ্ছা শক্তি সঞ্চার করতে পারেন। অতএব তাঁকে দর্শনে যে ক্ষমতা নিহিত থাকতে পারে তা তাঁর বক্তব্যের

মাঝে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। নবীগণ খোদার সেই বাক্যালাপের জন্যই তো নিজেদের জীবন বাজি রেখেছেন। **জাগতিক** কোনো প্রেমিক কি এমনটি করতে পারে? এই বাক্যালাপের কারণে কোনো নবী এক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করে পিছু হটেননি এবং কোনো নবী অবিশ্বস্ততাও প্রদর্শন করেননি। অর্থাৎ দাবি যখন করেন (তখন) তাতে অবিচলও থাকেন। উহুদের যুদ্ধ সম্পর্কে মানুষ বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছে, কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো, সে সময় খোদা তা'লার প্রতাপান্বিত ঐশী বিকাশ ঘটেছিল এবং মহানবী (সা.) ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে তা সহ্য করার শক্তি ছিল না, যে কারণে তিনি (সা.) সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং অন্যান্য সাহাবী সে পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে পারেননি। মহানবী (সা.)-এর জীবনে খোদা তা'লার প্রতি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার যেরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় তা আর কোথাও নেই। একইভাবে তাঁর (সা.) সপক্ষে যত ঐশী সাহায্য-সমর্থন প্রকাশিত হয়েছে তারও দৃষ্টান্ত পাওয়া ভার।

এটির বাকি অংশ পরবর্তীতে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্। এখন আমি প্রথমে আমাদের জামা'তের একজন প্রবীণ সেবক, মুরব্বী ও মুবাল্লিগ সিলসিলাহ ড. জালাল শামস সাহেবের স্মৃতিচারণ করতে চাই। তার জানাযা আমি গতকাল পড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু জুমুআর নামাযে আমি তার স্মৃতিচারণের ইচ্ছা করেছি। একজন যোগ্য, কর্মকুশলী, সাদাসিধে এবং বিশ্বস্ত ওয়াকেফে জিন্দেগী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ৭৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

১৯৬৯ সালে তিনি জামেয়াতে ভালো নম্বর নিয়ে শাহেদ ডিগ্রি লাভ করেন এবং কিছুদিন পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত ছিলেন। অতঃপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর নির্দেশে তাকে তুর্কি ভাষা শেখার জন্য পাকিস্তানের ইসলামাবাদে প্রেরণ করা হয়। তারপর তুর্কি ভাষায় উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য ১৯৭৪ সনে তাকে তুরস্কে প্রেরণ করা হয় যেখান থেকে তিনি তুর্কি ভাষায় ভালো নম্বর নিয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর নির্দেশে যুক্তরাজ্যে চলে আসেন। এখানে তিনি (প্রথমে) ইংল্যান্ড, তারপর জার্মানীতে মুবাল্লেগ হিসেবে সেবা প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। এ কারণে তার পরিচিত বিভিন্ন মানুষ তুর্কি থেকেও লিখছেন, জার্মানী থেকেও এবং যুক্তরাজ্য থেকেও লিখছেন। তার পরিচিতি ও জানাশোনা লোকের গণ্ডি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। যাহোক, এরপর তাকে ইংল্যান্ডে তুর্কি ডেস্কের ইনচার্জ মনোনীত করা হয় এবং আমৃত্যু তিনি এই পদে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সাথে সেবা প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে পরম বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা দান করেছেন। তুর্কিতে যখন তিনি তুর্কি ভাষায় ডিগ্রি লাভ করেন তখন ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় তাকে প্রফেসর হিসেবে চাকরির প্রস্তাব দেয় আর তা অনেক ভালো চাকরি ছিল, উচ্চ বেতনও ছিল। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর নিকট এ বিষয়ে নির্দেশনা জানতে চান। হুযূর এটি বলেননি যে, করো কিংবা কোরো না। তিনি (রাহে.) বলেন, তুমি দোয়ার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নাও এবং চিন্তাভাবনা করে পদক্ষেপ গ্রহণ করো যে, তুমি মূলত কী চাও? তিনি দোয়া করেন এবং আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নিজের ওয়াকফকে প্রাধান্য দান করেন আর সে চাকরি প্রত্যাখ্যান করেন। ২০০২ সালে তুর্কিতে এক সফরকালে ইসলাম-আহমদীয়াতের তবলীগের কারণে তাকে দুজন সঙ্গীসহ বন্দি করা হয় এবং সাড়ে চার মাস তিনি বন্দি হিসেবে কাটানোর সৌভাগ্যও লাভ করেন। তার গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে নিজ সহকর্মীদের নিয়ে তুর্কি ভাষায় কুরআন করীমের অনুবাদও অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ডজন খানেক পুস্তক অনুবাদ, অন্যান্য আরও অনেক

তরবিয়তী-তবলীগী লিফলেট, প্যাম্ফলেট, তুর্কি ভাষায় বইপুস্তক লেখার ও ছাপার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি একজন জ্ঞানী মানুষ ছিলেন, অধ্যয়নের আগ্রহ ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খলীফাদের বইপুস্তক ও রচনাসমূহ অত্যন্ত সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অধ্যয়ন করতেন। বইয়ের ওপরেই নোট নিতেন। জামা'তী বইপুস্তক ছাড়াও জ্ঞানবিজ্ঞানের নানান বইপুস্তক পড়ার আগ্রহ ছিল। অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন আর বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের কাছে সেসব জ্ঞানগর্ভ বিষয়াদি অতি সূক্ষ্মতার সাথে বর্ণনা করতেন। যেখানে কঠিন মনে হতো কিংবা যখন তিনি বুঝতে পারতেন না তখন অহংকার প্রদর্শন না করে জুনিয়র মুরব্বীদের কাছেও জিজ্ঞেস করে নিতেন। ভাষা রপ্ত করার খোদা প্রদত্ত প্রতিভা তার মাঝে ছিল, বরং এক্ষেত্রে দক্ষতা রাখতেন। উর্দূ আর পাঞ্জাবী এমনিতেই তার মাতৃভাষা ছিল। এছাড়া তুর্কি ভাষাতেও তিনি পিএইচডি করেছিলেন আর তাতে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। একইভাবে ইংরেজি, আরবী, জার্মান এবং ফার্সি ভাষাও কমবেশি বলতে পারতেন। বরং কোনো কোনো স্থানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে আরবী জানা কেউ না থাকার কারণে তিনি আরবীতে অনুবাদও করেছিলেন। তিনি সারায়েকিও কমবেশি বলতে পারতেন। খুতবা শেষ হবার পরপরই তিনি তুর্কি ভাষায় খুতবার অনুবাদ করতেন আর তিনি তুর্কি ভাষাতেও অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন, তুর্কি ভাষাভাষিরা তার রপ্তকৃত শব্দভাণ্ডারের প্রশংসা করত। বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রেও তিনি বেশ পারদর্শী ছিলেন। যাহোক, মরহুম অনেক গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ্‌র অধিকার আদায়ের পাশাপাশি বান্দার অধিকারও যথাযথভাবে আদায় করতেন। তিনি আত্মীয় অনাত্মীয় সবার সাথেই সমান ভালোবাসার আচরণ করতেন। অনেকে আমার কাছে চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে, তিনি সহানুভূতিশীল এবং নিতান্তই সাধাসিধে মানুষ ছিলেন। যাদের সাথে সাক্ষাৎ হতো তাদের স্মৃতিতে তার এক অম্লান ছাপ রয়ে যেতো। আল্লাহ্‌র প্রতি অগাধ আস্থাশীল মানুষ ছিলেন তিনি। দরিদ্র, মিসকীন ও সাহায্যের মুখাপেক্ষিদের তিনি গোপনে সাহায্য করতেন। খিলাফতের সাথে অনেক ভালোবাসার ও গভীর প্রেমের সম্পর্ক তার ছিল। তিনি সত্যস্বপ্ন দেখার অভিজ্ঞতা রাখতেন। অধিক হারে যিকরে এলাহি করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তান, স্ত্রী এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের ধৈর্য ও সাহস দান করুন আর তার পুণ্যকর্মসমূকে অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য দান করুন।

দ্বিতীয়ত আমি তিন ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব এবং গায়েবানা জানাযাও পড়াব। প্রথমটি হলো জনাব ইব্রাহীম ভামড়ী সাহেবের। তিনি কয়েকদিন পূর্বে ১০৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার জন্মের কাগজপত্রে ক্ষেত্রভেদে তার বয়স ১০৬ বলে সাব্যস্ত হয় আবার কখনো ১০৯। যাহোক, তার বয়স কমপক্ষে ১০৬ অবশ্যই ছিল। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন আর তার বংশে আহমদীয়াতের বীজ বপিত হয় তার পিতা চৌধুরী আব্দুল করীম সাহেবের মাধ্যমে। তিনি ১৯১৮-১৯১৯ সনে বয়আত করেন।

ইব্রাহীম ভামড়ী সাহেব নিজের পিতার বয়আতের ঘটনা বলতে গিয়ে লিখেন, আমার বংশে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আহমদীয়াত আমার পিতার মাধ্যমে প্রবেশ করে। আমার পিতা প্রথমে আহলে হাদীস ফেরকার অনুসারী ছিলেন। ১৯১৮ সনের দিকে তার দৃষ্টিশক্তি বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। চোখের ছানির রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার জন্য কাদিয়ানের নূর হাসপাতালে চলে আসেন। আমার পিতা বেশ সুখ্যাতিসম্পন্ন হবার কারণে মানুষজন সংবাদ

পেয়ে যায় যে, আমার পিতা হাসপাতালে ভর্তি, তাই অনেকে সেবাশুশ্রূষা করার উদ্দেশ্যে আসতে থাকে। মাস্টার আব্দুর রহমান, মেহের সিন্‌গ এবং অন্যান্য বুযুর্গরাও আসতে থাকে এবং চৌধুরী সাহেবের সেবাযত্ন করতে থাকে। আর এই বুযুর্গরা তাকে তবলীগও আরম্ভ করে দেন। ভামড়ি সাহেব লিখেন, আমার পিতার মস্তিষ্কে বেশ ভালোভাবে একথা গেঁথে যায় যে, হযরত ঈসা (আ.) পরলোক গমন করেছেন আর হৃদয়ে একথা গেঁথে যায় যে, হযরত ঈসা (আ.) জীবিত নেই বরং মারা গিয়েছেন। তার হৃদয়ে এই বিশ্বাস প্রথিত হয়ে যায় যে, মসীহ্ মওউদ (আ.) একেবারে সঠিক, সত্য। যেহেতু ঈসা (আ.) মারা গিয়েছেন তাই প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমনের প্রয়োজন ছিল, আর মসীহ মওউদ এর আগমনের এটিই সঠিক যুগ ছিল, এখন যদি তিনি না আসেন তাহলে আর কবে আসবেন? তিনি কাদিয়ানে নিজ অসুস্থতার দিনেই বয়আত করেন আর যখন নিজ গ্রাম ভামড়ি ফিরে যান তখন লোকেরা তার আহমদীয়াত গ্রহণ সম্পর্কে জানতে পারে। তখন তারা তার কাছে এসে অনেক হা-হুতাশ করে। তারা বললো, মিয়া আব্দুল করীম সাহেব! যদি আমরা জানতাম আপনি কাদিয়ান গিয়ে মির্যায়ী হয়ে যাবেন তাহলে আপনি অন্ধ হয়ে গেলেও আমরা আপনাকে কাদিয়ান যেতে দিতাম না। তার পিতা উত্তর দিতেন, আমার শারিরীক দৃষ্টিশক্তির সাথে সাথে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তিও প্রখর হয়ে গেছে। তিনি আরও বলতেন, শারিরীক দৃষ্টির চেয়ে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার ভাষা আমার নেই তিনি আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। আমি বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সত্য।গ্রামের লোকদের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এত বিদ্বেষ ছিল, মোল্লারা প্রত্যেকের হৃদয়কে এতটা বিষিয়ে রেখেছিল যে, তারা বলতো, আপনি যদি মাহদী হবার দাবি করেন তাহলে আমরা আপনাকে গ্রহণ করব, কিন্তু মির্যা গোলাম আহমদকে মানব না। এতে তার পিতা বলতেন, লক্ষ্য করে দেখো! এটাই সত্যতার নিদর্শন। আমি তাঁকে গ্রহণ করেছি এবং সত্য জেনে বুঝে মেনেছি, তাই তোমরাও মেনে নাও। তার পিতা ভামড়ি সাহেবকে এবং তার ছোট ভাইকে ১৯২৬ সালে মাদ্রাসা আহমদীয়া কাদিয়ানে ভর্তি করে দেন। দৈনিক পাঁচ মাইল সফর করে তারা স্কুলে পড়তে আসতেন। তার পিতা ১৯৩১ সালে মৃত্যু বরণ করেন। তখন তার ভাইয়েরা (মরহুমের চাচারা) তার মা-কে ইব্রাহীম ভামড়ি সাহেব এবং তার ছোট ভাইকে নিকটবর্তী কোনো স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে এবং কাদিয়ানের স্কুলে না পাঠাতে বলেন, কেননা কাদিয়ান অনেক দূরে। কিন্তু তার মা বলেন আমি এমনটি করতে পারব না। তাদের পিতা যেহেতু মাদ্রাসা আহমদীয়াতে ভর্তি করিয়েছেন, তাই এখন তারা মাদ্রাসা আহমদীয়াতেই পড়ালেখা করবে। তিনি বলেন, এভাবে আমরা কাদিয়ান যেতে থাকি। কাদিয়ানের মাদ্রাসায় সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করে তিনি জামেয়াতে পড়াশোনা করেন। সে সময় সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করলে জামেয়াতে ভর্তি হওয়া যেত। ১৯৪১ সালে ব্যক্তিগতভাবে মেট্রিক পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯৩৯ সালে মৌলভী ফাযেল পাশ করেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাসীদা তার সম্পূর্ণ মুখস্থ ছিল। দুররে সামীন [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর নযমের সংকলন], কালামে মাহমুদ [হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এর নযমের সংকলন]-এর অনেক নযম তার মুখস্থ ছিল। অসংখ্য উদ্ধৃতি মুখস্থ ছিল। খুব দ্রুত তিনি উদ্ধৃতি দিয়ে দিতেন। ১৯৩৯ সনে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৌলভী ফাযেল পাশ করার পর তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ

সানী (রা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন তখন তিনি (রা.) বলেন, দাপ্তরিক কাজ শিখুন। ১৯৪৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে মাদ্রাসা আহমদীয়াতে ধর্ম ও আরবী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। ১৯৪১-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত জামা'তের কাজ করেন। ১৯৪১-১৯৪৪ তিন বছর হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের (রা.) ব্যক্তিগত সহকারি হিসেবে কাজ করেন। এছাড়া নাযারত বায়তুল মালেও কাজ করেছেন, কেননা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) দাপ্তরিক কাজ শেখার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এরপর ১৯৪৭ সালে তালীমুল ইসলাম উচ্চবিদ্যালয় কাদিয়ানে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। দেশভাগের পর তালীমুল ইসলাম উচ্চবিদ্যালয় রাবওয়াতে সেবা করার সুযোগ পান। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এই সেবা অব্যাহত থাকে। ১৯৭৪ সালে তিনি স্কুল থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৭৫-১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ওয়াকফে জাদীদ দপ্তরে ইন্সপেক্টর ওয়াকফে জাদীদ নাযেম ইরশাদ হিসেবে কাজ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) এর সাথেও কাজ করতেন। তার নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে সফর করতেন এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতেন। মুয়াল্লেমদেরকে পড়ানোর দায়িত্বও তিনি সম্পাদন করেছেন। পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় যাবৎ তিনি দারুন নসর মহল্লার সদর হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। ইমামুস সালাত ছিলেন। তারাবির নামাযও পড়াতেন। পবিত্র কুরআনের অনেকাংশ তার মুখস্থ ছিল।

তার এক মেয়ে বলেন, আত্মীয়স্বজনের সাথে তার আচরণ ছিল দৃষ্টান্তমূলক। রাবওয়ার বাইরে যে আত্মীয়রাই বসবাস করত, তাদের সবার সন্তানেরাই আমাদের বাড়িতে থেকে পড়ালেখা করেছে। তার দীর্ঘ ও কল্যাণমণ্ডিত কর্মময় জীবনের রহস্য ছিল, ভোর বেলায় ফজরের সময় উঠে পড়া, বেশি বেশি যিকরে ইলাহী করা, হাঁটা (প্রাতঃ ভ্রমণ) এবং সাইকেলে করে স্কুল ও অফিসে যাওয়া। অতীব সাধারণ আহার করতেন আর সর্বদা সল্পেতুষ্ট থাকতেন। খলীফাগণের প্রতি সীমাহীন ও আন্তরিক ভালোবাসা পোষণ করতেন। (তার কন্যা) বলেন, আমরা তাঁর সব সন্তানসন্ততি প্রবাসে বসবাস করি। তাকে বিদেশে আসতে বললে তিনি বলতেন, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কবরে আমার প্রতিদিন দোয়া করতে যেতে হয়, তাই আমি বিদেশে যেতে পারবো না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সাথে তার এক বিশেষ ভালোবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তার কাছে যখনই কেউ দোয়ার জন্য যেতো সর্বপ্রথম বলতেন, যুগ খলীফার কাছে পত্র লিখো তারপর আমি দোয়া করব। তারপর তিনি হাত উঠিয়ে তার জন্য দোয়া করতেন। ঘুমানোর আগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আরবী কাসিদা (ইয়া আইনা ফাইযিল্লাহে ওয়াল ইরফানী) পুরোটা পাঠ করতেন।

তিনি (তার কন্যা) আরও লিখেছেন, আমার পিতা প্রায়শই একটি স্বপ্নের উল্লেখ করতেন যা তার (মরহুমের) পিতা, মেয়ের দাদা দেখেছিলেন। তা হলো, ইব্রাহীম খেজুর গাছে আরোহন করছিল আর সে ভয় পাচ্ছিলো সে কোথাও পড়ে না যায়। কিন্তু চোখের পলকে খেজুর গাছের শেষ প্রান্তে উঠে যায়। (তার কন্যা বলেন) আমার পিতা এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছেন তার নিজের দীর্ঘ জীবন এবং জ্ঞানার্জন।

নাযের দিওয়ান পাকিস্তান শেখ মুবারক আহমদ সাহেব লিখেছেন, আমি তার ছাত্র ছিলাম। পরে পাঁচ বছর তার সহকর্মী হিসেবে স্কুলে শিক্ষকতাও করেছি। ভামড়ি সাহেব দীর্ঘদিন ছাত্রাবাসে শিক্ষক (টিউটর) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ছাত্রাবাসে আহমদী ও অ-আহমদী সকল ছাত্রের সাথে প্রেম-প্রীতি ও স্নেহের আচরণ করতেন। প্রত্যেক ছাত্রের স্বভাব-চরিত্র অনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য তরবিয়তের ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতেন।

ছাত্ররাও খুব দ্রুত তাঁর সাথে মিশে যেত এবং পিতার মতো সম্মান ও শ্রদ্ধা করত। অধিকাংশ সময় তিনি ছাত্রাবাসে অতিবাহিত করতেন। নামাযের ইমামতি করতেন। নামাযের বিষয়ে সকল ছাত্রদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতেন এবং অনেক আদর-স্নেহ এবং ভালোবাসা রাখতেন। (হুযূর বলেন) আমিও তার ছাত্র ছিলাম। তিনি আমার সাথে কঠোরও হয়েছেন কিন্তু একইসাথে সহানুভূতি ছিল, সংশোধন ছিল উদ্দেশ্য। আমি যখন নাযের-এ-আ'লা ছিলাম, তখন তার কঠোরতার কথা স্মরণ করালে তিনি হেসে দিতেন।

পাড়ার সদর হিসেব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বলতেন, আমি সেই সকল পরিবার সম্পর্কে জানি যাদের বাড়িতে কোনো পুরুষ মানুষ নেই বা কেবল মহিলারা থাকেন। পুরুষরা কাজের জন্য, ভ্রমণে বাইরে গেছে। বাজারে যাওয়ার পথে আমি সেই সকল পরিবারের সাথে দেখা করতাম এবং শহরে কোনো কাজ থাকলে জেনে নিতাম। একটি থলে থাকতো, কাগজ কলম থাকতো, কী কী জিনিস এনে দিতে হবে তার তালিকা তৈরি করতেন। ক্রয়কৃত জিনিসগুলো প্রত্যেকের বাড়িতে পৌঁছে দিতেন। কারো চিঠি থাকলে তাদের চিঠি-পত্র ডাকঘরে গিয়ে পোস্ট করে দিতেন। চিঠির উত্তর আসলে ডাকঘর থেকে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিতেন। আবার নিরক্ষর কেউ যদি চিঠি পড়ে শোনাতে বলতেন তাহলে পড়ে শুনিয়েও দিতেন।

অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন, কখনো কারো কোনো কথা অন্য কাউকে বলতেন না। হালকা প্রেসিডেন্ট হওয়ার কারণে মহিলারা তাদের অভিযোগ, স্বামীদের দুর্বলতা তার কাছে নিয়ে আসত। তিনি স্বামীদেরকে বুঝতে না দিয়ে সঠিক সময়ে উপদেশ দিয়ে বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করে দিতেন। মোটকথা এলাকার পুরুষ, মহিলা এবং শিশু সবাই তাকে পিতার ন্যায় স্নেহশীল পেত। এই হলো আসল পদ্ধতি কীভাবে কর্মকর্তারা মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকবেন এবং তাদের সংশোধনের চেষ্টা করবেন। মুরুব্বীদেরও উপদেশ দিতেন যে, নযমও মুখস্থ করো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নযমের পংক্তিও পাঠ করো। এগুলোর মাঝেও উপদেশাবলী রয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন, আমি প্রত্যহ কাসীদা পাঠ করে ঘুমাতে যাই। অতএব এটিও মুরুব্বীদের জন্য উপদেশ।

তার জীবদ্দশায় তার এক কন্যাকে গ্রাম থেকে রাবওয়া আসার পথে শহীদ করে দেয়া হয়। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য এবং সন্তুষ্টচিত্তে এই মর্মযাতনা সহ্য করেছেন। তারপর অপর এক কন্যা লন্ডনে মৃত্যু বরণ করেন। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। মরদেহ রাবওয়া আনা হয়। সে সময়ও তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এই বেদনা সহ্য করেছিলেন, বরং অন্যদেরও ধৈর্য ধারণের পরামর্শ দিতেন।

যাহোক, তিনি সকল দিক থেকে এক সফল জীবন যাপন করেছেন এবং দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেছেন। প্রায়শ বলতেন, পরকাল ইহকালের তুলনায় অনেক সুন্দর। আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তানসন্ততিকেও তার পুণ্য কর্মগুলো সচল রাখার তৌফিক দান করুন।

পরবর্তী যার জানাযা আমি পড়াব তিনি হলেন, ইউসুফ জারে সাহেব। তিনি ঘানার অধিবাসী। বিগত দিনে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

ঘানার আমীর এবং মিশনারী ইনচার্জ লিখেন, মরহুম মুসী ছিলেন। নিষ্ঠাবান আহমদী বন্ধু ছিলেন। বিভিন্ন পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। জামা'তের প্রচুর সেবা করার তৌফিক লাভ করেছেন। মৃত্যুকালে দুটি আহমদীয়া সিনিয়র হাই স্কুলের বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে সেবা

প্রদান করছিলেন। শিক্ষা বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। অবসর গ্রহণের আগ পর্যন্ত পোর্টসন এবং এরপর কামাসী এলাকার আহমদীয়া সিনিয়র স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে সেবা প্রদান করেছেন। ইউসুফ সাহেব ঘানার খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর হিসেবেও সেবা প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-র ১৯৮৮ সালের সফরের সময় তিনি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর হিসেবে সেবা প্রদান করছিলেন এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়েও অনেক সেবা প্রদান করেছেন। মরহুম তালীম বিভাগের সাথে সংযুক্ত ছিলেন। আহমদী যুবকদের শিক্ষার ব্যাপারে সর্বদা সচেতন থাকতেন। তার এক পৌত্র বর্তমানে মুরব্বী সিলসিলাহ হিসেবে সেবা প্রদান করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ আলহাজ্জ উসমান বিন আদম সাহেবের, তিনি ঘানার অধিবাসী। তিনিও ৮১ বছর বয়সে বিগত দিনে মৃত্যু বরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার সম্পর্কে আমীর এবং মিশনারী ইনচার্জ সাহেব লিখেন, ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। একান্ত নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। সময়মত নামায আদায়কারী, নিয়মিত চাঁদা প্রদানকারী, জামা'তী কাজে উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণকারী, খিলাফতের প্রতি আন্তরিক, বিশ্বস্ততা রক্ষাকারী এবং এই স্পৃহা তিনি তার সন্তানদের মাঝে প্রবিষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। নিজ সন্তানদের ধর্মীয় এবং জাগতিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখতেন। কুরআন মজীদের ফান্টী ভাষার অনুবাদের পিছনেও তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কুরআন মজীদের ফান্টী ভাষায় অনুবাদের সময় তিনি বড়ো ধরনের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তার স্ত্রী বলেন, মরহুম পরম সহিষ্ণু স্বভাব এবং স্নেহশীল ব্যক্তি ছিলেন। ২০১২ সালে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় হজ্জ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। জামা'তের বহু সদস্যকে তিনি কুরআন পড়িয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। তার সন্তানদেরও তার পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দিন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)